সাইয়্যেদ কুতুবের চিন্তার পুনর্পাঠ: প্রেক্ষিত মাইলস্টোনস

ইউসুফ রাইওস

সামাজিক পর্যায়ে ইসলামি মূলনীতি, আদর্শ ও মূল্যবোধের অভাবে যেসব সমস্যা একটার পর একটা প্রকট হয়ে উঠছিল, সেগুলোই জায়গা করে নিয়েছিল বিশ শতকের শেষের দিকের ইসলামি চিন্তাধারায়। সাইয়্যেদ কুতুব এই বাস্তবতা ব্যাখ্যা করতে চেয়েছিলেন কুর□আন প্রদত্ত বৈশিষ্ট্যের আলোকে এবং সামাজিক বলয়ে এর প্রয়োগকে সম্প্রসারিত করার মাধ্যমে। কুর□আন থেকে তিনি যেসব ধারণা নিয়েছিলেন তার মধ্যে একটি ছিল □জাহেলিয়াত□ (অজ্ঞতা ও অবিশ্বাসের যুগ; ওহী নাযিলের পূর্ববর্তী সময়)-এর ধারণা।

মাইলস্টোনস প্যামফ্লেটে জাহেলিয়াতের যে ধারণা প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে, প্রায়ই সেটাকে মুসলিম বিশ্বে সহিংসতার কারণ হিসেবে দায়ী করা হয়। বলা হয়, মুসলিম বিশ্বে ঔপনিবেশিকতার জের ধরে সভ্যতার সংঘাতের ফলে যে সমসাময়িক রাজনৈতিক ব্যবস্থা তৈরি হয়েছে তার উৎখাতে কুতুবের জাহেলিয়াতের ধারণা প্রভাব ফেলছে। আল-কুর□আনে জাহেলিয়াতের ধারণাটি যেভাবে এসেছে তার প্রেক্ষিতে জাহেলিয়াতের পরিভাষাগত তত্ত্বায়নের সমর্থনে নুসুসি (textual) প্রমাণ রয়েছে। তবে অনেকে আপত্তি তুলতে পারেন যে, জাহেলিয়াত শব্দটির আভিধানিক অর্থকে কুতুব ছোটো করে দেখেছেন এবং এর পরিবর্তে এমন এক ভিন্ন অর্থ চাপিয়ে দিয়েছেন যার র‍্যাডিকাল রাজনৈতিক গুরুত্ব রয়েছে। গত শতকের শেষ ভাগের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট অনেকের বোঝাপড়াকেই পক্ষপাতিত্বের দিকে ঠেলে দিয়েছে। এর ফলে চিন্তাবিদ ও বুদ্ধিজীবী হিসেবে কুতুবকে ভুলভাবে পাঠ করা হয়েছে। তাঁকে ঔপনিবেশিকতাবাদের কারণে উদ্ভূত সামাজিক বাস্তবতার রাজনৈতিক সংকটের মুখোমুখি হতে হয়েছে।

কুতুবের মাইলস্টোনসকে বিপ্লব ও সহিংসতার প্রচারপত্র হিসেবে যে তকমা দেওয়া হয় সেটাও তাঁর লেখাকে সঠিকভাবে না বোঝার পরিণতি। যেমন এই লেখার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ একটি ধারণা জাহেলিয়াতকেই বিকৃত অর্থে নেওয়া হয়েছে। তাঁর লেখা পড়ে অনেকে এই তর্ক করতে পারেন যে, জাহেলিয়াতের যে ধারণা তিনি দিয়েছেন তা সহিংসতাকে বৈধতা দেয় কেননা এই ধারণা অনুযায়ী ইসলামি শাসন বাদে অন্য যেকোনো রাজনৈতিক ব্যবস্থাকেই অবৈধ মনে করা হয়। অন্যকথায় এটা সহিংসতাকে বৈধতা দেয়।

> কিন্তু এই অর্থটা সঠিক নয়। অমুক বা তমুক রাজনৈতিক ব্যবস্থা কুতুবের উদ্বেগের বিষয় নয়। বরং ক্ষয়ে যাওয়া ও ম্লান হয়ে যাওয়া ইসলামি মূল্যবোধ নিয়েই তিনি উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। তাঁর কাছে ইসলামি শাসনব্যবস্থার অভাব জাহেলিয়াত নয়, বরঞ্চ জাহেলিয়াত হল সেই অবস্থা যেখানে ইসলামি মূল্যবোধের অভাব রয়েছে। এটি তাঁর লেখনির কেন্দ্রীয় আলোচ্য বিষয়। সামাজিক অস্থিরতা নিয়ে তিনি উদ্বিগ্ন কেননা মূল্যবোধের অবক্ষয় থেকেই এর উৎপত্তি। মুসলিম হিসেবে ইসলামি মূল্যবোধ ও ইসলামি জীবন থেকে আমরা কতটা দূরে তার বোঝাপড়া নিয়েই তিনি আচ্ছন্ন। তাঁর মতে আল-কুর□আনকে তার মর্যাদাপূর্ণ আসন থেকে সরিয়ে দেওয়ার ফলেই উদ্ভব হয়েছে এমন পরিস্থিতির। ফলে আমরা দেখি যে, নয়া জাহেলিয়াতে আল-কুর□আন মুসলিমদের জীবনে কেন্দ্রীয় ভূমিকায় নেই। আল-কুর□আন মুসলিমদের জীবনকে পরিচালিত করে না। আর সমাজে মূল্যবোধের সংকটের পেছনে এটাই কারণ।

তারপরও কেউ হয়তো বলতে পারেন যে, মুসলিম জীবন থেকে আল-কুর্আনের কেন্দ্রীয় ভূমিকার অপসারণ নয় বরঞ্চ ইসলামি আইনের অভাবই কুতুবের লেখনির মূল বিষয় এবং একেই বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। কুতুবের মাইলস্টোনস-এ কেবলমাত্র রাজনৈতিক ব্যবস্থার সহিংস উৎখাতকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে- এভাবে ধরে নিলে তাঁর চিন্তাধারার গুরুত্বপূর্ণ একটা দিক আমাদের নজরের বাইরে থেকে যাবে। কুতুবের মতে সভ্যতাকে মানুষের মানবিক পরিস্থিতি তুলে ধরতে হবে; মানবিক ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে। এ ব্যাপারগুলো মূল্যবোধ থেকে তৈরি হয়, ঐ অর্থে বিপ্লব থেকে নয়।

গণতন্ত্র-পুঁজিবাদ এবং সামরিক-সমাজতন্ত্রকে কুতুব দেখেছেন এমন কিছু চিন্তাপদ্ধতি (systems of thought) ও প্রয়োগ আকারে যা ঐতিহাসিকভাবে অন্তিম পর্যায়ে পৌঁছে গেছে। কেননা এই প্রক্রিয়াগুলোতে বস্তুগত উন্নতি হলেও এগুলোতে রয়েছে সেসব মূল্যবোধের অভাব যা মনুষ্যত্বকে সংরক্ষণ করে। গণতন্ত্র-পুঁজিবাদে মানুষ ভোগবাদী বস্তুবাদের বশীভূত হয়ে পড়েছে। পুঁজিবাদ যদিও মানুষের বস্তুগত অবস্থা উন্নত করেছে, কিন্তু বেশিরভাগ মানুষকেই এটি প্রান্তিক করে ফেলেছে, তাদের মনুষ্যত্বকে কেড়ে নিয়েছে। অন্যদিকে কুতুবের মতে, সামরিক-সমাজতন্ত্র অন্তর্গতভাবেই অসংখ্য দ্বৈততায় পরিপূর্ণ। এটা জন্ম দিয়েছে বিপর্যয়কর সর্বাত্মক স্বৈরতন্ত্রের (totalitarianism)। জাহেলিয়াত তাই এমন একটি সময়ের কথা বলছে যেখানে মূল্যবোধের অভাব তার রাজত্ব কায়েম করেছে যা কার্ল জেসপারের axial age-এর সম্পূর্ণ বিপরীত। কুতুবের মাইলস্টোনস এর পঠন-পাঠনে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই যে ঘাটতি দেখা যায় তা হল মূল্যবোধ এবং সমাজ সংস্কারে মূল্যবোধ চর্চার প্রতি তাঁর অবস্থান ধরতে ব্যর্থ হওয়া। সাইয়্যেদ কুতুবের মতে একটি সভ্যতার মূল্য নিহিত সেসব মূল্যবোধের মধ্যে যেগুলো মানবতার চর্চা করে। আর সেই চর্চা শুধু অর্থনৈতিক বা রাজনৈতিক পর্যায়ে সীমাবদ্ধ নয়, বরং এর মধ্যে আছে আধ্যাত্মিকতা, বুদ্ধিবৃত্তিকতা এবং আবেগ। মূল্যবোধ সংক্রান্ত কুতুবের এই চিন্তা বিশেষ করে আমরা যারা পশ্চিমে বাস করি তাদের জন্য অত্যন্ত সহায়ক।*

দুর্ভাগ্যজনকভাবে কুতুবের মাইলস্টোনসকে অনেকে শুধু সহিংসতার উস্কানি হিসেবে পড়ে থাকেন এবং একে সহিংসতার বুদ্ধিবৃত্তিক বৈধতা দানকারী হিসেবে বিবেচনা করেন। এভাবে পড়ার কারণে তিনি সমাজ ও সভ্যতা সম্পর্কে যে গুরুত্বপূর্ণ একটি দিক আমাদের শেখাচ্ছেন তা লোকচক্ষুর আড়ালে থেকে যায়। আর তা হচ্ছে সমাজ ও সভ্যতা যদি অস্তিত্বমান থাকতে চায় তাহলে তাদেরকে মানবতার সেবা করতে হবে। আর সেটা হতে হবে এমন মূল্যবোধ সঞ্চারের মাধ্যমে যা জীবনের অর্থ খুঁজে দেয়, যা গোটা মানবজাতিকে সংরক্ষণ করে, গড়ে তোলে; কেবল বস্তুবাদী মানবিক সংস্কৃতিকে মদদ দেয় না। অন্তত মাইলস্টোনস বইয়ের প্রথম দিকে চিন্তার যে ধারা সঞ্চারিত করা হয়েছে তা হচ্ছে মূল্যবোধগুলো পুনরায় স্থাপনের মাধ্যমে সমাজের সংস্কার করা, সমাজকে পুনর্জাগরিত করা। এ মূল্যবোধগুলো গোটা মানবজাতির পরিস্থিতির কথা তুলে ধরবে আর তা এমনভাবে করবে যার মাধ্যমে বস্তুগত উন্নতির সঙ্গে মিশেল হবে উদ্দেশ্য ও তাৎপর্যের।

রাজনৈতিক-দার্শনিক হবেসর প্রকৃতি ও সমাজ সংক্রান্ত দর্শন বিষয়ক কিছু আলাপ:

প্রকৃতিগতভাবে মানুষ আসলে ভালো নয়। বরং সে স্বার্থপর সুখবাদী (hedonist) - প্রতিটি মানুষ ঐচ্ছিকভাবে যে কাজগুলো করে তার মধ্যে তার নিজের কিছু না কিছু ভালো লাগা আছে। প্রকৃতিগত পর্যায়ে মানবিক প্রেরণা অনালোকিত স্বার্থ দ্বারা চালিত হয়। এগুলোকে যদি নিয়ন্ত্রণে রাখা না-হয় তাহলে এগুলোর পরিণতি হতে পারে মারাত্মক ধ্বংসাত্মক। যদি অনিয়ন্ত্রিত রাখা হয় তাহলে মানুষ তার অভ্যন্তরীণ শক্তির প্রেরণায় একে অপরের সঙ্গে সংঘাতে জড়িয়ে পড়বে। কোনো সিভিল স্টেট বা আইনের শাসনের পূর্বে কোনো সমাজের প্রকৃতিগত চরিত্র কেমন হবে সেটা কল্পনা করতে চেয়েছেন হবস। তাঁর উপসংহার ছিল হতাশাব্যঞ্জকঃ জীবন হবে নিঃসঙ্গ, দরিদ্র, জঘন্য, নৃশংস ও সংক্ষিপ্ত এবং প্রত্যেক মানুষের সঙ্গে প্রত্যেক মানুষের লড়াই।

কিন্তু তারপরও যেহেতু সব মানুষ সমান (নৈতিকভাবে নয়, শারীরিকভাবে), সবার মধ্যেই রয়েছে টিকে থাকার অদম্য আগ্রহ (প্রাকৃতিক অধিকার), এবং কিছু পরিমাণে বিচারবুদ্ধি (প্রাকৃতিক আইন), এ থেকে হবস এই সিদ্ধান্তে আসেন যে, উপরোক্ত দুই বিপরীতধর্মী শক্তির মাঝেই সাম্যবস্থার উদ্ভব হবে, একটি সমর্থ ও কার্যকরী সমাজ গড়ে উঠবে। যুক্তিটা বেশ সরল। যেকোনো ব্যক্তির প্রকৃতিজাত অধিকার প্রত্যেকের বিরুদ্ধে সহিংসতাকে ন্যায্যতা দেয়। ফলস্বরূপ, ব্যক্তিগতভাবে টিকে থাকার স্বার্থে মানুষ এ ব্যাপারে একমত হবে যে, তাদেরকে এই সহিংসতার অধিকার ছাড়তে হবে। তবে এর ফলে উত্তেজনাপূর্ণ ও অস্থির ভারসাম্যের সৃষ্টি হয়। যে মুহূর্তে কোনো একজন ব্যক্তি তার ওয়াদা ভঙ্গ করবে, তখন সবাই ভঙ্গ করবে, ফলে পুনরায় শুরু হবে লড়াই।

মৌলিকভাবে সাইয়্যেদ কুতুবের জাহেলিয়াত-র ধারণা এটাই। প্রধানতঃ মাইলস্টোনস-এর শুরুতে তিনি ইসলামিক নৃতত্ত্বের মূল ধারণাগুলোর রূপকল্প তুলে ধরেছেন আর এগুলো তিনি আল-কুর্আন থেকেই নিয়েছেন। এগুলোই তাঁর এই লেখনির গতি নির্ধারণ করেছে। তাঁর তত্ত্ব দুটো মৌলিক মূলনীতিকে ঘিরে:

১) পৃথিবীতে মানুষের প্রতিনিধিত্ব

২) ইবাদাতই মানুষের জীবনের উদ্দেশ্য

কুরআন নির্দেশিত এ দুটো ধারণাকে অন্যান্য আনুষঙ্গিক ধারণার মাধ্যমে সমকালীন করে ব্যক্ত করা হয়েছে। এগুলো কুতুবের অ্যানথ্রো-পলিটিকস তত্ত্বের (সমাজে মানুষের ধারণা সংক্রান্ত তত্ত্ব) নির্দেশক এবং স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য। মানুষ যখন বিশ্বজগতে, আরও ভালোভাবে বললে সমাজে (আল-মুজতামা') তার মর্যাদা ও উদ্দেশ্যকে উপলব্ধি করতে শেখে এবং ব্যবহারিকভাবে তার প্রকাশ ঘটায় তখনই তার নিজ সম্পর্কিত জ্ঞান পূর্ণ বিকাশ লাভ করে এবং ব্যক্তি হিসেবে তার চূড়ান্ত বিকাশ ঘটে। স্থান-কালের এ জগতে মানুষকে প্রতিনিধিত্বের (খিলাফাহ্‌) মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। অন্যদিকে সুবিন্যস্ত বস্তুজগতে মানুষই সবকিছুর মানদণ্ড নয়; বরং এটা আল্লাহর কাজ। কুতুব এটা বিশ্বাস করেন যে, আল্লাহই মানুষকে তাঁর প্রতিনিধি হিসেবে নির্বাচিত করে এক অনন্য মর্যাদা দিয়েছেন। এর মানে এটাই যে সৃষ্টিজগতে মানুষই সবচেয়ে ওপরে। আর আল্লাহর কাছে থেকেই মানুষ এবং অন্যান্য সৃষ্টি জীবনের উদ্দেশ্য ও তাৎপর্য খুঁজে পায়।

কুতুবের দৃষ্টিতে অস্তিত্ব হচ্ছে সত্ত্বার থিও-সেন্ট্রিক বিন্যাস। এখানে সত্ত্বার অর্থ ও উদ্দেশ্য স্বভাবজাত ও অন্তর্গত। এটা মানুষের অলীক কল্পনা ও ব্যাখ্যার উপর ছেড়ে দেওয়া হয়নি। এ কাঠামোতে মানুষ সবকিছুর মানদণ্ড নয়, বরং সবকিছুর জন্য তারা আল্লাহর কাছে দায়বদ্ধ। উপরন্তু মানুষ একা বাস করে না। সৃষ্টিজগতে অন্যান্য মানুষ ও প্রকৃতির সঙ্গে তার সহাবস্থান। এই জায়গায় এসে কুতুব ন্যায়পরায়ণতা ও ন্যায্য বিচার (আদল ওয়াল-কিস্ত)-এর কথা বলেছেন। আরও নির্দিষ্ট করে বললে, মনুষ্য সমাজে অন্যান্য মানুষের সঙ্গে সহাবস্থানের ক্ষেত্রে তার জীবন ও সম্পর্কের মান কেমন হবে সেটা নিয়ে কথা বলেছেন। তাঁর মতে, মানুষের সাথে মানুষের সম্পর্কের ক্ষেত্রে স্বাধীনতাই বিবেচ্য বিষয় হবে, তবে চূড়ান্ত স্বাধীনতা সম্ভব নয় যা অন্যের ক্ষতির কারণ হয় যেমনটি দেখা যায় জাহেলিয়াতের ক্ষেত্রে; স্বাধীনতার সাথে অবশ্যই দায়িত্বশীলতা থাকতে হবে। কুতুবের ভাবনা অনুসারে মানুষের সঙ্গে মানুষের ঐক্যই সমাজ। কিন্তু সেই সমাজ যদি জীবন্ত হতে চায়, মানব অস্তিত্বের বাস্তবতা সর্বোচ্চ পর্যায়ে লালন করতে চায় এবং জীবনের উদ্দেশ্যকে বাস্তবায়ন করতে চায় তাহলে অবধারিতভাবে এর ঐক্যের ভিত্তি হবে আইনি বিধি (হাকিমিয়্যাহ)।

সর্বপ্রথম মৌলনীতি হল সার্বভৌম কর্তৃত্ব এবং আইনী বিধি প্রণয়নের হক (হক আল-ওয়াদাআ) একমাত্র আল্লাহর। এর সমর্থনে তিনি দুটো উৎসের উল্লেখ করেছেনঃ নুসুসি ও ঐতিহাসিক। প্রথমটি আল-কুরআন আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে রাসূল (সা) ও সাহাবিদের (রা) সময়। কুতুবের মতে রাসূল (সা) ও তাঁর সাহাবিদের সময়টা মাননির্ধারক। এই সময়ে ইসলাম ছিল জীবন্ত, মূর্ত ও বাস্তব যা ঐতিহাসিক বাস্তবতায় প্রোথিত।

কুতুবের অ্যানথ্রো-পলিটিকস অনুযায়ী আল-কুরআনে শুধু মানুষের সূচনা এবং আল্লাহর সঙ্গে তার সম্পর্কের কথা বলা হয়নি, বরং এখানে মানুষের জীবনের উদ্দেশ্য নিয়েও কথা বলা হয়েছে। তবে কুরআন শুধু সেখানেই থেমে থাকেনি বরং সমাজে মানুষের সঙ্গে মানুষ ও প্রকৃতির সম্পর্ক নিয়ে কথা বলেছে। এই সম্পর্ক বৈধ হতে হলে যেসব মূল্যবোধ ও গুণাবলির ভিত্তিতে তাদের পরিচালিত হওয়া উচিত সেগুলোকে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে।

সাইয়্যেদ কুতুব ও নবীজীর সমাজের পরিস্থিতি ও মানদণ্ডের ভিন্নতার কারণে তিনি বিশেষভাবে রাজনীতির ক্ষেত্রে আল্লাহ্‌র সার্বভৌমত্বের কথা বলেছেন তবে রাজনীতিই সেখানে মূখ্য বিষয় নয়। তাঁর মতে জীবনের জরুরী মূল্যবোধ (কিয়াম), জীবন-দুনিয়া ও আইন (শরীয়াহ্‌) এবং এর মানদণ্ড (কানুন) সংক্রান্ত মৌলিক ধারণা (তাসাউরাত) নির্ধারণের একচ্ছত্র অধিকার আল্লাহরই। দুর্ভাগ্যজনকভাবে মাইলস্টোনস-এ তিনি হাকিমিয়্যাহর ধারণাটিকে যেভাবে তুলে ধরেছেন বেশিরভাগ পর্যালোচনায় সেটাকে সংকীর্ণ অর্থে তুলে ধরা হয়। হাকিমিয়্যার যে বহুমাত্রিক দিক তিনি তুলে ধরেছেন তার স্থলে কেবল এর রাজনৈতিক গুরুত্বকেই মূখ্য হিসেবে তুলে ধরা হয়। তিনি যে বিভিন্ন বাস্তবতার গুরুত্ব মাইলস্টোনে উল্লেখ করেছেন অধিকাংশ পাঠেই তা অবহেলিত থেকে যায়। এগুলোর মধ্যে অন্যতম হচ্ছে:

১) পৃথিবীতে মানুষের ভূমিকা

২) সামগ্রিক ধারণা আকারে ইবাদাতের ভূমিকা

৩) মানুষের জীবনে এবং সমাজে মূল্যবোধের (কিয়াম) ভূমিকা

৪) বস্তুগত সংস্কৃতি তথা জ্ঞান, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থা, উৎপাদন ইত্যাদির ভূমিকা

৫) পৃথিবীর রূপান্তরে বুদ্ধিবৃত্তি ও তাত্ত্বিক ধারণার (conceptualization) ভূমিকা

৬) ব্যক্তি ও সামাজিক সত্ত্বা হিসেবে সমাজ (মুজতামা□) এবং গোটা উম্মাহর কল্যাণে মানুষের ভূমিকা

৭) সমাজ নির্মিত মূল্যবোধের সীমাবদ্ধতা ও সম্ভাব্য নেতিবাচকতা এবং দর্শনের সীমাবদ্ধতা

৮) জালিম শাসনব্যবস্থার সমস্যা

৯) নেতৃত্বের রূপরেখা

১০) মানুষ ও সমাজজীবনে প্রভাব ফেলতে পারে এ ধরণের □আকীদাহ□ বিষয়ক বইয়ের ঘাটতি

সূত্রঃ VirtualMosque.com

ইউসুফ রাইওস

ইউসুফ রাইওস পেন্নিসিলভানিয়ার ফিলাডেলফিয়ায় জন্মগ্রহণ করেন। যখন তিনি একজন ক্যাথলিক ধর্মযাজক হতে যাচ্ছিলেন ঠিক সেই মুহূর্তে ইসলামের হেদায়াত পান। এরপর থেকে ইসলামকে ভালোভাবে জানতে শুরু করেন। তিনি □ইসলামিক ইউনিভার্সিটি অফ আমেরিকা□ তে পড়াশোনা শুরুর আগে কয়েক বছর ওহিও-এর ক্লিভল্যান্ডে কয়েকজন আলেমের কাছে সাত বছর ধরে ইসলামী জ্ঞানের বিভিন্ন শাখা অধ্যয়ন করেন। □ইসলামিক ইউনিভার্সিটি অফ আমেরিকা□ তে তিনি আরবি শিখেন এবং সেখানে নির্দিষ্ট কিছু ইসলামিক সাইন্সে নিবিড়ভাবে পড়াশোনা করেন। তারপর তিনি মিশরের কায়রোতে যান এবং সেখানে পাঁচ বছর অবস্থান করেন। সেই সময়ে তিনি আরবি শিক্ষা কেন্দ্রেগুলোতে অনেকগুলো □ইনটেন্সিভ কোর্স□ করেন। এসব কোর্সের পর তিনি বিভিন্ন আলেমদের হালাকায় অংশগ্রহণ করতে শুরু করেন। এখানে অসংখ্য উস্তাদ রয়েছেন যারা ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ে অভিজ্ঞ, তিনি তাদের কাছ থেকে ইসলামের বিভিন্ন উসূল সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করেন। তিনি আল-আযহার বিশ্ববিদ্যালয় থেকে □ইসলামি মনোবিজ্ঞান ও ঐতিহ্য□-এ পড়াশোনা করেন। □উসূল আল-হাদীস□-এ তার সাধারণ ও বিশেষ □ইজাযা□ রয়েছে। এসবের সাথে তাঁর অন্যান্য শিক্ষাগত যোগ্যতা হলোঃ তিনি পশ্চিমা দর্শন ও সমাজবিজ্ঞানে অনার্স করেছেন এবং শিক্ষাতত্ত্বে মাস্টার্স করেছেন।